।। চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।।

উপসংহার : তবুও বিশ্বাস

প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪–১৮) পর থেকে সমগ্র যুগের বুকে সমস্যা এবং সঙ্কটের যে আভাস জেগে ওঠে, তাকে রূপায়িত করার চেষ্টা বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতেও শুরু হয়ে গিয়েছিল। যুগ - সঙ্কটের অশান্ত ঝটিকা, অসুস্থতার শ্বাস-রোধকারী পরিবেশ যে-ভাবে জমাট বাঁধছিল, কথা-সাহিত্যেও তার প্রকাশ দুর্লক্ষ্য হল না। সেই মুহূর্তে স্বভাবে রোমান্টিক ও বোহেমিয়ান কল্লোল গোষ্ঠীর ভাবনায় ও আচরণে যথেষ্ট নতুনত্বের চমক অনুভূত হয়েছিল।[১] প্রথাবিরোধী জেহাদ এবং সুস্থতারহিত যুগ-পরিবেশকে শিল্পরীতির মাধ্যমে উপস্থাপিত করতে গিয়ে সে-দিন যথেষ্ট সক্রিয়তা দেখিয়েছিলেন কল্লোলের সাহিত্যিকবৃন্দ। তা-সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নাই — "যে গভীর সমাজচৈতন্য থাকলে তাঁরা বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে দেশের মানুষের হৃদয়-রহস্যে ডুব দিতে পারতেন, দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে অবহিত হতেন—সেই সমাজ-চৈতন্য তাঁদের ছিল না। তাই তাঁদের দৃষ্টি সমাজনিষ্ঠ নয়, ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, অহংকেন্দ্রিক, রোমান্টিক স্বপ্নাতুর। তাঁরা রুষ উপন্যাসের দিকে ঝোঁকেননি, ঝুঁকেছিলেন 'ন্যাচারালিজম'-এর দিকে – হ্যামসুন, জোলা ('জারমিনাল' ব্যতীত), লরেন্স-এর দিকে। একটা 'বোহেমিয়ানী' রোমান্টিক বিদ্রোহ তাঁদের উপন্যাসে আছে কিন্তু মৃত্তিকার দৃঢ়সম্পর্ক তার সঙ্গে নেই।"[২]

এর পর-পরই বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করেছিলেন তিরিশের একটি বিশিষ্ট ধারার তিন মহারথী : তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ ও মানিক; যাঁরা 'তিন বন্দ্যোপাধ্যায়' নামে সুপরিচিত।[৩] এঁদের মধ্যে অবশ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই যুগ-ব-ধর্মত্ব এবং অসুস্থতাকে বৈজ্ঞানিক-নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য ছিল : "ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সাহিত্যে আমাকে বাস্তবকে অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল। কোন সুনির্দিষ্ট জীবনাদর্শ দিতে পারিনি, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার অভাব মিটিয়েছি।" মানিকের প্রথম দিকের গল্প এবং 'দিবারাত্রির কাব্য', 'চতুষ্কোণ' প্রভৃতি উপন্যাস এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে

আলোচিত হওয়ার দাবি রাখে । ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্ব —মনোবিকলনের যে নজির তিনি উপস্থাপিত করলেন —তাও এতদিন ছিল প্রায় অভাবিত । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলতে গিয়ে, আরও একজনের নাম আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করব । জগদীশচন্দ্র গুপ্ত । ব্যক্তি চরিত্রের নৈঃসঙ্গ্য ও অসহায়তার যন্ত্রণাকে রূপায়ণের ক্ষেত্রে মানিক মানসিকতার উদ্বোধন সূচিত হয়েছিল এই জগদীশচন্দ্র গুপ্তের মাধ্যমেই । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় সমসাময়িক প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখনীতে অগ্রজ সাহিত্যিক জগদীশচন্দ্রের নিরাবেগ তীক্ষ্ণতা হয়তো ছিল না, (তাঁর সুপ্রাতুর মেজাজটি অনেক সময়েই প্রাধান্য বিস্তার করতে চেয়েছে) তবুও বলা যেতে পারে বাস্তবের রূপরেখাকে স্বীকৃতি জানানোর তাগিদে বিভিন্ন উপন্যাস ও ছোটগল্পে তিনি যথেষ্টই চমকপ্রদ হয়ে উঠেছিলেন । সেই সময়ে 'পাঁক' এবং 'নঘুগুরু', 'অসাধু সিদ্ধার্থ' প্রভৃতি উপন্যাস যে মোড় ফেরার সঙ্কেতকে চারধারে পৌঁছে দিচ্ছিল —সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নাই ।

এসে গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯—৪৫) ভয়ঙ্কর পর্ব । এই বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া মানুষের মন থেকে সামান্য স্বস্তিটুকুও মুছে দিল । এই পর্বটির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা বুঝতে পারব আঘাতে আর বিপর্যয়ে বাংলার সমাজ-সত্তা-ভবিষ্যৎ কী-ভাবে ছিন্নভিন্ন ও রক্তাক্ত হচ্ছিল । মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ছিন্নমূল জীবনের দুঃসহ বেদনা আমাদের এতদিনকার সহজ-সরল বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতাকে প্রবাহিত করল সম্পূর্ণ নতুন এক খাতে । অনেক স্বপ্নের, অনেক প্রতিশ্রুতির যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছিলাম —সেখানে অ-সুখের যন্ত্রণা কম ছিল না । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে সাহিত্য-চেতনায় সমাজ নয়, ব্যক্তিই বড় হয়ে উঠল । ব্যক্তিচরিত্রের এই প্রকাশমুখিতা ও প্রতিষ্ঠা তার নিজস্ব যন্ত্রণা, অসহায়তা, সংশয়, অবিশ্বাস, ঘৃণা, ক্রোধ, অধঃপতন —এই সব কিছু নিয়েই । "আধুনিক মানুষ শিকড়হীন, সংযোগহীন, একলা । বিচ্ছিন্নতা আর নিরর্থকতাবোধে পীড়িত এই মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে প্রত্যয়ে আর প্রমূল্যে । অপরিসীম শূন্যতাবোধের শিকার এই মানুষ যেন পঙ্গু, — যেন, ডস্টয়েভস্কির ভাষায়, 'মৃতজাত'।"[৪]

এই পটভূমিতে আমরা উপন্যাসধারায় দেখতে পেলাম কিছু নতুন মুখ । এঁরা সতীনাথ ভাদুড়ী, সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র,

সন্তোষকুমার ঘোষ বিমল কর, সমরেশ বসু প্রমুখেরা। সতীনাথ ছাড়া অন্যরা প্রত্যেকেই প্রায় সমসাময়িক। কিছু আগে বা পরে। চল্লিশ-এর পর্বটি তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন যথেষ্ট সচেতনতা দিয়েই।[৫] 'বারো ঘর এক উঠোন; 'চেনা মহল', 'কিনু গোয়ালার গলি', 'বিবর' ইত্যাদি উপন্যাসগুলিতে সে-দিন উপজীব্য হয়েছিল মানসিক বিচ্ছিন্নতা, আত্মিক বিষাদ, অবচেতনের অন্ধকার, তীব্র যৌনতা, নৈতিক অধোগামিতা, বিবেকের দংশন, শূন্যতার কিছুর অন্বেষণ। বিপন্ন ব্যক্তি-সত্তার আর্তশ্বাস ও আত্মিক সঙ্কটকে প্রতিটি মুহূর্তে তাঁরা অনুভব করার চেষ্টা করছিলেন—সেই সাহিত্যিকদের বক্তব্য: আমরা এমন এক ভয়ঙ্কর সময়ের গহ্বরে প্রবেশ করেছি—যেখানে অসুস্থতার কালো ছায়া জমাট। অন্য কিছু চোখেই পড়ে না, এর কবল থেকে রেহাই পাওয়ার আশাও ক্ষীণ। এই তমসাবৃত মুহূর্তকে কবির দৃষ্টিতে অনুমান করা যেতে পারে:

আমার দুচোখ অন্ধ, আমি শুধু অন্ধকারে দেখি
অতীতের ধূলা আর ভবিষ্যৎ রাবিশে কাদায়
বোজানো ডোবার জল
তোমাদের প্রাণের পলুলে মানুষ বাঁধে না বাসা
স্রোতের বিস্তার নেই
মাছও নেই, কাদা, ধূলা, মরা ব্যাঙ
রৌদ্রে শুকায়.....।

(বিষ্ণু দে, 'টাইরেসিয়স')

বর্তমানে আমাদের আলোচনার কে-দুবি-দু বিমল কর। এই প্রবীণ ঔপন্যাসিকের বেশিরভাগ উপন্যাসেই অসুখের মারাত্মক যন্ত্রণা পরিস্ফুট। এই অসুখ শুধু শরীরে নয়, মনেও। মনে হয় শিল্পী তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির কায়িক এবং মানসিক অসুস্থতার গণ্ডিতেই নিজেকে সীমায়িত রাখেননি; সামগ্রিক ভাবেই যুগ-অবক্ষয় ও সঙ্কটের আগ্রাসনকে নির্দেশ করতে চেয়েছেন। আলোচনার তাগিদে ঔপন্যাসিকের পনেরোটি প্রাসঙ্গিক উপন্যাসের মাধ্যমে আমরা লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন চরিত্র টি. বি, ক্যানসার, লিউকোমিয়া, কুষ্ঠ, ইনস্যানিটি প্রভৃতি ভয়ঙ্কর ব্যাধিতে আক্রান্ত। শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে চরম অবসাদ এবং গ্লানিতেও তারা সমাচ্ছন্ন হয়েছে।

এই সব ভয়াবহ রোগগুলিকে অনায়াসেই বর্তমান সভ্যতার মারাত্মক ক্ষয়ের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে । জীবন যেখানে আর্ত ও উৎকণ্ঠিত --সেখানে বেঁচে থাকার মতন বলিষ্ঠতা কোথায় এবং কী ভাবে খুঁজে পাওয়া সম্ভব — এই ভাবনার মধ্যেই শিল্পীর বিষণ্ণতা প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে ।

লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে , ঔপন্যাসিক সৃষ্ট চরিত্রগুলি অধিকাংশক্ষেত্রেই নিজেদের অসহায় অবস্থাতে যথেষ্ট বিব্রত । কোণঠাসা-সঙ্কুচিত এই সব চরিত্রগুলি একাকিত্বের দুঃসহ যন্ত্রণায় ম্রিয়মাণ । সঙ্কোচ ও নৈঃসঙ্গ্য থেকে তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে আত্মিক অবসাদ । অসুস্থ মানুষগুলি প্রায়শই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে নিজেদের তৈরি প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে সামনের ফ্যাটে দিনগুলি কোনওক্রমে কাটিয়ে দেওয়ার জন্যে । চূড়ান্ত প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকই এইসব শূন্য মনগুলিতে এই জাতীয় বিচ্ছিন্নতা-বোধের জন্ম দিয়েছে । প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে , বর্তমান পৃথিবীর সমস্যাবলি এত প্রখর ও সংক্রামক , যেখানে কখনও সঙ্কট নিরসনের অবকাশ সত্ত্বেও সংশয় জেগেই থাকে ; যেমন রোগমুক্তির পরেও নর-নারীর অস্বাভাবিকতা সহজে দূর হয় না ।

আমরা জানি দৃঢ় প্রচেষ্টার মাধ্যমে নর-নারী অনেক সময়েই নিজেদের শুভাশুভ নির্ণয় করতে সমর্থ হয় । প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে । কিন্তু ঔপন্যাসিক সৃষ্ট বেশ কিছু চরিত্রের মধ্যে এক ধরনের মানসিকতা পরিস্ফুট , যেখানে নিয়তি নির্দিষ্ট অমোঘ পরিণতিই একমাত্র চূড়ান্ত , অন্য সব কিছুই অর্থহীন । এরা মৃত্যুভয়ে সদা আতঙ্কিত , জীবনের যাবতীয় উদ্যম থেকে সম্পূর্ণত নির্বাসিত । এই নিয়তিবাদী ভাবনা অবিশ্বাস্য বোধ হলেও — জীবনের চূড়ান্ত প্রতিকূলতাকে নির্দেশ করার ক্ষেত্রে মনে হয় সুপ্রযুক্ত । অস্বীকার করার উপায় নাই , অনেক সময় আমরা এমনভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি , যেখানে ভাগ্যের বিধানকে চিহ্নিতকরণ ব্যতীত অন্য অবকাশ থাকে না । মৃত্যুচিন্তামুখর সংশয়দীর্ণ এই ভাবনা বিপন্ন এবং আর্ত জীবনের শূন্যতাকেই প্রমাণ করতে চেয়েছে ।

কয়েকটি উপন্যাসে পারিবারিক সমস্যার কথা বিশেষভাবে ধরা পড়েছে । লোভ স্বার্থপরতা , উচ্চাশা , অসূয়া এই সব ক্ষেত্রে যৌথ পরিবারের শান্তি এবং সুখকে বিধ্বস্ত করেছে । এমনকী দাম্পত্যের স্নিগ্ধ নির্মল পরিবেশ পর্যন্ত কলুষিত হয়েছে ।

স্ত্রী যেখানে সহধর্মিনী হিসাবে নয়, স্বামীর রক্ষিতা রূপে নিজেকে ভাবতে চেয়েছে, সেখানে দাম্পত্য সম্পর্কের অ-সুখকে চিহ্নিত করতে অসুবিধা ঘটার কথা নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পারিবারিক কাঠামোর ভিতর পুরাতন ও নতুনের দ্বন্দ্ব, চিন্তাধারার পার্থক্য চোখে পড়ে। (মনে হয় অতীতের তুলনায় বর্তমানটা যেন বড় বেশি বদলে গেছে, এই পরিবর্তনে সুস্থতা অন্তর্হিত, অন্ধকারই প্রখর নখরে সক্রিয়) ফলত সঙ্ঘাত অনিবার্য। শিল্পী-দৃষ্টিতে ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেলেও সেই সম্ভ্রম-দৃপ্ত অধ্যায়টির অবক্ষয় জনিত বেদনাও কম নয়। (এ ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচারে তারাশঙ্করের কথা ভাবা যেতে পারে) এক ভয়ঙ্কর কালবেলার মধ্যে যে বর্তমান ক্রিয়াশীল, সেখানে সান্ত্বনার মতন কিছু আছে কি না --তাই নিয়েই সংশয়ী হয়ে উঠেছেন শিল্পী।

সময়ের সাক্ষী হিসাবে ঔপন্যাসিক যে ক্রুদ্ধ -ক্ষুব্ধ, আত্মঘাতী- অসুস্থ যুবসমাজের ছবি তুলে ধরেছেন --তাও রীতিমত ভাবনার বিষয়। প্রথানুগত্যের প্রতি অস্বীকৃতি, ঐতিহ্যে আস্থাহীনতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, --এই সব কিছুর মধ্যে স্পষ্টতই তিনি সমাজের স্বার্থপর এবং ভঙ্গুর কাঠামোকে অভিযুক্ত করেছেন। বিভ্রান্ত ও বিপথগামী 'এই যুবকেরা' যে সর্বোতোভাবেই অসুস্থ ও বিকৃত সমাজ ব্যবস্থার শিকার --সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি তিনি।

উপন্যাসগুলির মধ্যে শিল্পীর মানসিকতা বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে উঠবে -- অতীত তাঁর কাছে এক মনোরম অভিজ্ঞতা। বর্তমানের ক্ষতবিক্ষত মুহূর্তে সেই সকল রম্য দিনগুলির কথা মনে করে বিষণ্ণতা অনুভব করেন তিনি। বুকের মধ্যে বারবার আছড়ে পড়ে শূন্যতার ঢেউ : কোথায় গেল সেইসব প্রিয় দিন, চেনা মুখ! এই অতীতমুখিতা --স্মৃতিমেদুরতা শিল্পী মানসিকতাকে আর্ত করে তুললেও তাঁর সৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে স্নিগ্ধ মাধুর্যে।

অনেকগুলি উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়, মানুষের জীবনকে তিনি প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে সংস্থাপন করে বিশ্লেষণ প্রয়াসী হয়েছেন। আমাদের জীবনকে অনেক সময়েই তুলনা করা হয়েছে গাছের সঙ্গে -- তার শিকড়ের সঙ্গে। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু শিকড় ছড়িয়ে যায় মাটির গভীরে, --কে জানে--কতদূর পর্যন্ত তার বিস্তার। একইভাবে, যে জীবনকে বাইরে থেকে এক রকম মনে হয়; অন্তর্নিহিত

প্রক্রিয়ায় তাই-ই হয়তো অন্যরকম । ঠিক শিকড়ের মতই । বুকের মধ্যে যে দুঃখ অ-সুখ , গোপন গভীর ভাবনা জমাট বেঁধে উঠেছে , তা সহসা কারও চোখে ধরা পড়ে না । উপন্যাস-শিল্পী চকিত উদ্ভাসনে সেই অনুভব এবং আকৃতিকে ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন ।

কখনও কখনও শিল্পী জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত ও সুখহীনতা জনিত অতৃপ্তির মধ্যে জীবন-সত্যের অন্বেষণে আকুল হয়ে উঠেছেন । পূর্ণের স্বরূপ কী ? অপূর্ণের যন্ত্রণাই বা কোথায় ? —এই সকল প্রশ্নের দার্শনিক সমীক্ষায় অন্তরিক আগ্রহ তাঁর । অসুখের প্রদাহকে বুকের মধ্যে বহন করেও জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করতে ইতস্তত করেননি তিনি ।

ঔপন্যাসিক অসুখের উপমাকে শুধুমাত্র সভ্যতার সঙ্কটে প্রতিমান হিসাবে ব্যবহার করেই থেমে থাকেননি । আরোগ্য এবং শুশ্রূষার কথাও উচ্চারিত হয়েছে তাঁর মুখ থেকে ; ভালবাসার অমোঘ সত্যকে প্রত্যয়নিষ্ঠ ভাবে তুলে ধরেছেন তিনি । তাঁর মতে : ভালবাসাই আরোগ্য , গ্রহণেই সুখ । তাই লিউকোমিয়া , ক্যানসার , যক্ষ্মা — প্রভৃতি যত ভয়ঙ্করই হোক, ভালবাসা এবং মমতার উষ্ণ বিশ্বাস অনেক সময়েই আর্ত-শূন্য অন্তরগুলিকে উজ্জীবিত করেছে । শিল্পীর বক্তব্য : নিছক চিকিৎসা-প্রক্রিয়া — কেমোথেরাপি প্রভৃতিতে নয় , ভালবাসার শক্তিতে —বিশ্বাসের সাবল্যেও 'ডিজিজ অব সিভিলিজেশান'কে অতিক্রম করা সম্ভবপর হবে ।[৬]

উপন্যাস শিল্পী বিমল কর মূলত অন্তর্লোকের শিল্পী । তাঁর লেখনীতে ঘটনার নাটকীয়তা কম । ফেনায়িত আতিশয্য একেবারেই পছন্দ নয় ; তাঁর রূপকাশ্রয়ী লেখনী চকিতে উদ্ভাসিত করে তোলে মানব-মানবীর 'হৃদয় তল' । সচেষ্ট হয় 'গ্রন্থি' উন্মোচনে । সমালোচকের মতানুযায়ী :

> "মনোবিশ্লেষণের গভীরতায় চল্লিশের দশকের একজন লেখক নরেন্দ্রনাথ অপেক্ষাও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । তিনি বিমল কর (১৯২১—) বস্তুত তাঁর সমকালীন লেখকের মধ্যে জীবনদৃষ্টির প্রজ্ঞায় ও শিল্পায়নের পরিণতিতে বিমল করের প্রতিভাই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর । ঘটনা তাঁর

উপন্যাসে অপ্রধান। ঘটনা-বিরল কাহিনীর মধ্য
দিয়ে লেখক বলে যান এমন এক জীবনের ইতিবৃত্ত
যা পাঠক মনের অনেক তলদেশ দিয়ে বয়ে যায়।
ডুবুরির মতন হৃদয়ের গভীর থেকে তিনি তুলে আনেন
বহুবিধ রত্নরাজি এবং দু'একটা কঙ্কাল। অবচেতনের
স্বরূপ পরিচয় পেয়ে পাঠক নিজেদের চিনতে শেখেন,
বিশ্লেষণ করতে শেখেন।"[৭]

অসুস্থ জগৎ ও জীবনের চিত্রণ, অবচেতনের জটিল রহস্য ও প্রগাঢ় বিষাদ-ময়তা যেমন তাঁর শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য; তেমন-ই আবার প্রজ্ঞাদৃপ্ত দর্শননিষ্ঠ ভাবনা এবং ভালবাসা ও বিশ্বাসের শুশ্রূষাবোধও তাঁর মানসিকতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তিনি অস্তিত্ববাদী চিন্তাকে প্রশ্রয় দিয়েও পাঠকের অনুভবকে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন এমন এক জগতে, — যেখানে নৈরাশ্যের অন্ধকার অতিক্রম করে উত্তরণের আলোক-তীর্থটি সুস্পষ্ট। শিল্পী মনে করেন, — "মাটির ফুলদানি না ভাঙার কোনও কারণ নেই, কিন্তু সেটা জোড়া দিয়েও রাখা যেতে পারে।"[৮]

সাহিত্য-আলোচক ঔপন্যাসিক বিমল কর সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে শিল্পী মানসের একটি বিশেষ দিকের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন: "প্রজন্ম-ব্যবধান বিমল করের উপন্যাস-ভাবনার একটি স্থায়ী প্রসঙ্গ। মানুষের বা ব্যক্তির জন্মলব্ধ স্বাধীনতাকে ও স্বাধীনতার দায়কে বিমল কর অনুভব করেন। তাঁর উপন্যাসে সেই আধুনিক অস্তিত্বগত যন্ত্রণার দেখা পাই। পট এবং ব্যক্তিকে মুখোমুখি স্থাপন করে দুটোকেই তিনি অভিনিবেশের লক্ষ্য করতে চান। কিন্তু তাঁর উপন্যাস সব সময় এই সংঘর্ষজাত অগ্নিকুণ্ডকে এড়িয়ে চলে।"[৯] ঔপন্যাসিক পৃথিবী বিস্তারী অসুস্থতা সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রাতে সচেতন। বর্তমানের বুকে দাঁড়িয়ে পেছনে বা সামনে—যে দিকেই তাকানো যাক না কেন সামাজিক অবক্ষয় ও ব্যক্তি চরিত্রের বিনষ্টি ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ে না। সাহিত্যিক ভাবনার মধ্যেও অনিবার্যভাবেই এই যন্ত্রণাদীর্ন স্বাক্ষরটি পরিস্ফুট। সাহিত্যিক বিমল করের চিন্তা-ভাবনার এই পরিচয়কে তাঁরই একটি নিবন্ধের মধ্যে ছোঁয়া যেতে পারে:

"এক একটা সময় আসে আমাদের জীবনে যখন সব কেমন হুড়মুড় করে ঘাড়ে এসে পড়ে। সমাজ নাড়া খায়, পারিপার্শ্বিক তছনছ হতে চায়, চিড় ধরে বিশ্বাসে, বোধবুদ্ধি থমকে যায়। গত চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরের ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা এমনই এক সময়কে দেখতে পাব। গত বিশ্বযুদ্ধ, আমাদের স্বাধীনতা লাভ, সাতচল্লিশের পর থেকে গোটা একটা যুগ— কত রকম কাণ্ড ঘটে গেছে; সামাজিক রাজনৈতিক, একের পর এক বিপর্যয় এসেছে কত রকমের। ঘা খেয়েছে সাধারণ মানুষ, বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে তার কথা আমরা জানি। সেই দিনগুলির পর বাহ্যত এমন কিছু ঘটেনি যা রাতারাতি আমাদের সচকিত সন্ত্রস্ত করতে পারে। নকশাল আন্দোলনের পর্বটি অবশ্যই এর মধ্যে ঝড়ের মতন এসেছিল, তার অস্থিরতা অনুভব করা গিয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে, গত চল্লিশ বছর আগে যা ঘটেছে, এবং তারপর যা ঘটে যাচ্ছিল সেই অভিজ্ঞতার জেরই টেনে চালাচ্ছি আমরা।

পিছনের এই ইতিহাসটুকু মনে রাখলে বোঝা যায়, একালের মানসিকতায় অতীতের আঁচড় রয়েছে, রয়েছে ক্ষত। আমরা এখন যা ভোগ করছি —সবই তার ফলাফল। তবে, এটা স্বীকার করতে হবে, সময়ের নিজের এক প্রভাব রয়েছে, প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ যেমনই হোক।

একালের লেখকদের মানসিকতায় প্রধানত
যা চোখে পড়ে তা হল, এক ধরনের বেদনাময়
চেতনা। ক্ষোভ। আক্রোশ। অবিশ্বাস।
অনিশ্চয়তা। এঁরা মনে করেন, সুস্থিহীন,
ভরসাহীন এই জীবনে স্বাভাবিক প্রত্যাশাও অনর্থক।
জীবনছন্দের স্বাভাবিকতা, সুস্থতা সম্পর্কে যদি
এঁরা সন্দিহান হয়েই থাকেন —দোষারোপ করে
লাভ নেই। আপাতত আমাদের জীবন এবং
সামাজিক পরিবেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠার মতন নয়।
বিরক্তি, উষ্মা, নৈরাশ্য থেকে কেমন করেই বা
উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে।"[১০]

ঔপন্যাসিকের এই বিশ্লেষণ প্রসূত মতামতকে স্বীকৃতি জানিয়েও আমরা বলতে পারি বিমল করের মনের মধ্যে যত অন্ধকার —ঠিক ততটাই আলো; অনেকটা জীবনানন্দের মতনই। 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন'—এ সম্বন্ধে দ্বিধাহীন তিনি, কিন্তু 'অনন্ত সূর্যোদয়'কে প্রত্যক্ষ করার বাসনাও তাঁর মন থেকে লুপ্ত হয়ে যায়নি। তিমির-বিলাসী হয়ে নয়, তিমির বিনাশী ভাবনায় প্রাণিত উপন্যাস শিল্পীর বক্তব্য:

"চিন্তা করলে দেখা যাবে আমাদের এই
পৃথিবী বড় রুগ্ন। একটা **meaningless**
bad dream -এর মধ্যে আমরা বেঁচে-
বর্তে আছি। অনেক বাজে ব্যাপারই এড়িয়ে
যাওয়া সম্ভব হয় না, অসহায়ভাবে মেনে
নিতে হয়। হাহাকার বুকে নিয়েই লড়াই
করার জন্যে প্রস্তুত হতে হয় নিজেকে।
আমরা জানি দুঃখের মৃত্যু মানব জীবনে
নতুন মাত্রা এনে দেয়, কিছু চিন্তাকে নতুন
করে ভাবতে শেখায়। অসুস্থতা -ব্যাধি-মৃত্যু

আমার সাহিত্যে বারবার এসেছে। কি-তু
এ-কথাটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে —
অ-ধকার বা ঝড়ের মধ্যেও এমন কিছু সংগুপ্ত
যা অরুণোদয়ের ইঙ্গিত বহন করে ; নিষ্ঠুর
কুটিল চক্রান্তের ভিতরেও মায়াঘন পরিবেশের
স্বপ্ন দেখায়। অসুস্থ পৃথিবীর ছবি তুলে ধরলেও
চেষ্টা করি মানবিকতার মূল বিশ্বাসটুকু সযত্নে
জিইয়ে রাখতে। আমার মনে হয়, মানবিক
চেতনার প্রধান শর্তগুলি হল — rationality,
tenderness, sympathy ও responsibility.
গ্রহণেই যে বাঁচা সম্ভব —বর্জনে নয় ; তা আমার
ঐকান্তিক ধারণা। 'ভালবাসাই আরোগ্য'—এই
বোধের আলো আমার সাহিত্যে বারবার প্রতিফলনের
চেষ্টা করেছি।"[১১]

শিল্পীর বিভিন্ন উপন্যাসগুলি পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা তাঁর এই বক্তব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে পারি। তাঁর বক্তব্যের ভিতরে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়, চরম অসুস্থতা, মৃত্যুভাবনা, নৈরাশ্যের হাহাকার, নৈঃসঙ্গ্যের যন্ত্রণা প্রভৃতির মাধ্যমে অবক্ষয়িত যুগের দুঃসময়কে অঙ্কন করতে গিয়েও তাঁর মায়া-মেদুর, মানবিকতা-স্নিগ্ধ অমল দৃষ্টি ভঙ্গিতে এমন কিছু আভাস ফুটে উঠেছে —যা আমাদের সান্ত্বনা জোগায়, আশ্বস্ত করে। আমাদের মনে হয় এটা কোনও সুবিরোধের ব্যাপার নয়, বরং বলা ভাল, এই উজ্জ্বল বিশ্বাস-ই তাঁর সাহিত্যের স্থায়ী প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গ যথার্থ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যেই সময়ের যন্ত্রণা ও দায়কে স্বীকার করে নিয়ে ব্যাধিমলিন এবং অ-সুখী জীবনকে এবং সঙ্কটগ্রস্ত জগতকে তিনি তুলে ধরেছেন। এই কারণেই তাঁর উপন্যাসে পুনরাবৃত্ত হয়েছে অসুখের উপমা। আমরা তো ভাল নেই-ই, কি-তু ভাল না থাকার দুঃখকে ভুলে থাকার যে দুঃখ (যার জন্যে 'বিশুষ্ক বিক্ষোভও স্তিমিত') তার প্রতিও সাহিত্যিক বিমল কর উদাসীন নন। গোধূলির

বিষন্ন আলো শরীরে মেখে নিতে-নিতেই তিনি সকালের অমলকান্তি রোদ্দুরের প্রতীক্ষায় থাকেন। মাঝখানে রাত্রির গভীর সমুদ্রের বুকে সাঁতার কেটে চলা। এ-প্রসঙ্গে প্রাজ্ঞ সমালোচকের অভিমতটি বিশেষ ভাবেই উদ্ধৃতির দাবি রাখে : "..... সর্বার্থেই তিনি নাম সার্থক লেখক। 'বিমল কর' শব্দ বন্ধের যা বাচ্যার্থ, ব্যঞ্জনার্থে সেটাই তাঁর লেখক পরিচয়। মৃত্যুর যাত্রায় জীবনের অমল আলোর কথাই তিনি বার বার বলেছেন। বার বার তিনি আমাদের ধরিয়ে দিতে চান আলোর ঠিকানা, যার অপর নাম ভালবাসা।"[১২]

বস্তুত প্রবীণ কথাশিল্পী বিমল কর যুগ-যন্ত্রণার শরিক হয়ে অসুখের কালো ছায়া তুলে ধরেই তাঁর দায়িত্ব সম্পূর্ণ করেননি', একই সঙ্গে পবিত্র বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন —দেওয়ার চেষ্টা করেছেন; যা বাংলা উপন্যাসের স্রোতোধারায় তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, অনন্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

।। উল্লেখপঞ্জী ।।

১. গোকুল নাগের 'পথিক', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'বেদে' এবং প্রবোধকুমার সান্যালের 'যাযাবর'—প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ।

২. ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য, 'উপন্যাসের কথা', ১৯৬১, পৃ: ২২৮

৩. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত :
"তিরিশের প্রধান ঔপন্যাসিকদের বুদ্ধিপ্রধান (ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, গোপাল হালদার) এবং হৃদয়প্রধান (তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক) এই দুই পর্যায়ে বিভক্ত করলেও এই বিভাগের জন্য কঠিন সীমারেখা ব্যবহার করা চলে না ।"
দ্র: 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', ২য় দে'জ সং - ৮৮, পৃ: ২১২

৪. ড. অশ্রুকুমার সিকদার, 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস'- ৮৮, পৃ: ২২

৫. সতীনাথ এই ধারাতে একটু আলাদা । তাঁর 'জাগরী', 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' প্রভৃতির মত উপন্যাসে রাজনৈতিক চিন্তার প্রকাশ ঘটলেও তার নিছক প্রচার-ধর্মিতায় পর্যবসিত হয়নি । বাইরের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে দরদী মানসিকতাকে মাধ্যম করে তিনি অনায়াসে প্রবেশ করেছেন পাঠক-চিত্তের গভীরে,—গভীরতর সত্যটি অন্বেষণের তাগিদেই ।

৬. রোগ-পাণ্ডুর বিবর্ণ জীবনের প্রতি উপন্যাস-ধারার একটি নতুন যুগের স্রষ্টা টোমাস মান্-এর অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল । ব্যাধিগ্রস্ত জীবনের মধ্যেই তিনি মানসিক আনন্দ এবং বিকাশের কথা বলেছেন । তাঁর বক্তব্য ছিল : অসুস্থতা জীবনকে শুধুমাত্র নিঃশেষই করে না, সেখানে নতুন মাত্রাও যোজনা করে ।
দ্র: ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য, 'উপন্যাসের কথা', ১৯৬১, পৃ: ২৫১ ।

৭. ড. কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, 'বাংলা উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ', ১৯৮১, পৃ: ৬১

৮. বিমল কর, সূত্র : গবেষক কর্তৃক বিমল করের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ৭.১.৯০

৯. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর',
২য় দে'জ সং - '৮৮, পৃ: ৪০০

১০. বিমল কর, 'তরুণ গল্প লেখকদের মানসিকতা', সাপ্তাহিক 'দেশ',
৪ এপ্রিল '৮৭, পৃ: ৬৩-৬৪

১১. বিমল কর, সূত্র : গবেষক কর্তৃক বিমল করের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ৭.১.৯০

১২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল করের গ্রন্থ সমালোচনা প্রসঙ্গে,
রবিবাসরীয় --আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ অকটোবর '৯২